Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.831
Volume - 7, Issue - 01 January - 2024

DOIs:10.2018/SS/202401003 --:-- Research Paper / Article / Review

প্রযুক্তিবিদ রূপদর্শী রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য

Sukumar Roy
Ph.D. Research Scholar
Dept. of Bengali, Ranchi University, Ranchi, Jharkhand, India
Email - sukumarbck@gmail.com

Abstract: বর্তমান যুগে সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পিতামাতা সন্তানদের যে দুটি পেশার দিকে নিয়ে যেতে চান তা হল ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে ডাক্তারি পেশার ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল হলেও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রতি ততটা আগ্রহ দেখা যায়নি। এ কারণেই বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কিংবা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক লগ্নে বাংলা সাহিত্যে এই পেশার মানুষের অস্তিত্ব অনুসন্ধানে সাহিত্যিকেরা কিছুটা হলেও নির্লিপ্ততা দেখিয়েছেন। তবে মানুষের কবি, মাটির কবি রবীন্দ্রনাথের গল্প লেখার পড়ন্তবেলায় বেশ কয়েকটি গল্পে এই পেষার মানুষের অস্তিত্ব মেলে।

Key Words: প্রযুক্তিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য, মিশরের সাক্কারোহ-তে স্টেপ পিরামিড, ‘রবিবার’, ‘শেষ কথা’, ‘ল্যাবরেটরি’, ‘চোখেরবালি’ ।

1. INTRODUCTION:

সৌন্দর্যের অপার রহস্যলোকে, মানস সুন্দরীর অধরা মাধুরীর অনুধ্যানে প্রমত্ত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বিজ্ঞানমনস্ক রূপেও। সেই অর্থে তিনি বিজ্ঞান তাপস নন, কিন্তু রসাস্বাদনে পরান্মুখ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় কাঠামোয় ধরা দেননি কিন্তু বাড়িতে বসে জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রেও অলস ছিলেন না। ‘জীবনস্মৃতি’র ‘বাংলাশিক্ষার অবসান’ শীর্ষক অধ্যায়ে আছে অক্ষয়কুমার দত্তের ‘পদার্থ বিদ্যা’য় পদার্থ ও মনের সংযোগ স্থাপিত হয়নি কিন্তু সীতানাথ দত্তের প্রকৃতি বিজ্ঞান তিনি উৎসুক্য সহকারে অপেক্ষা করতেন—

> “যে-রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়া মনে হইত না।”[১]

সেই রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ এ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ‘জড় কি সজীব’ লিখে স্বয়ং জগদীশ বসুকে চমকে দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতি বিমুখতা ছিল, জীবন সত্যের সন্ধানী বলেই কিন্তু পরিণত বয়সে বিজ্ঞানচর্চাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। বিজ্ঞান জগৎ সংসারকে কাঙ্ক্ষিত প্রগতির শেষ সোপানে পৌঁছে দিতে সক্ষম। ‘জাপানযাত্রী’-তেও সেই কম ও যন্ত্র অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে তার সম্ভাবনা জানান। ১৯২৬ এ প্রথম জার্মানিতে আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল, দ্বিতীয় বার ১৯৩০-এ। তার ফল সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাথে ঘনিষ্ঠতা, ‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থ রচনা।

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবে ঐ জাতির পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যের বীজ রোপণের ইতিহাসের সাথে তিনি পরিচিতি ছিলেন। দেখেছেন জার্মানির যন্ত্র সাধনা, উনিশ শতকের শেষ দশকগুলো আর বিংশ শতকের শুরুর দশকগুলিতে যন্ত্রবিদ্যার হাত ধরে তার উত্থান। জার্মানির বিশ্বজোড়া কদর তখন তার ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য। দেখছেন বিজ্ঞান কীভাবে মর্তলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে, ইতিহাসের সূত্রে অবশ্য আমরা প্রথম প্রকৌশলী হিসেবে পাই ইমহোটেপের নাম। প্রায় ২৫৫০ খ্রি: পূ: মিশরের সাক্কারোহ-তে স্টেপ পিরামিড নির্মাণ করেছেন। পরবর্তীকালে বিবিধ নির্মাণ শিল্পে ইঞ্জিনিয়ারদের কদর বেড়েছে। আঠারো শতক থেকে পৃথক শৃঙ্খলা হিসেবেও যা বিবেচিত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রকৌশলের জনক স্যার মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরায়। ১৯১২-১৯১৮তে ১৯তম মহীশূরের এই দেওয়ান জাপান যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও আফ্রিকা পরিভ্রমণ করে ভারতবর্ষকে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অগ্রগতির মুখ্য লক্ষ্যে চালিত করেছেন।

2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT:

বর্তমান যুগে সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পিতামাতা সন্তানদের যে দুটি পেশার দিকে নিয়ে যেতে চান তা হল ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে ডাক্তারি পেশার ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল হলেও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রতি ততটা আগ্রহ দেখা যায়নি। এ সময় বাংলাতে কৃষিকাজের প্রয়োজনীয়তায় কৃষিবিজ্ঞানে চর্চা কিছুটা পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্ঞানকে এদেশীও জনগণ সহজে আপন বলে গ্রহণ করতে পারেনি।

> "যন্ত্রবিজ্ঞান এদেশীয় সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি কোনোদিনই। এজন্যেই কৃষিবিজ্ঞানের বহু পূর্বেই যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কারিগরী বিজ্ঞানের এই দিকটি নিয়ে গ্রন্থ রচনায় কোনোরূপ প্রবণতা বাংলায় দেখা গেল না।"[২]

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে এদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার প্রসারের কাঠামো গঠিত হয়। কিন্তু তখনও বাঙালি যন্ত্রবিদ্যাকে সাদরে বরণ করে নিতে পারেনি। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বিভাগের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকেও পাওয়া যায়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রুড়কী, পুনা, মাদ্রাজ ও কলকাতায় চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়।[৩] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছিল দুটি মাত্র প্রতিষ্ঠান। একটি হল—'The Thomason Civil Engineering College' Roorkee এবং অন্যটি হল—'The Government Engineering College' Sibpur ।[৪]

এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার ব্যবস্থা হয় ঠিকই কিন্তু এদেশীয় মানুষদের মধ্যে এই Profession বা বৃত্তির প্রতি তখনও তেমন আগ্রহ ছিল।[৫] এ কারণেই বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কিংবা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক লগ্নে বাংলা সাহিত্যে এই পেশার মানুষের অস্তিত্ব অনুসন্ধানে সাহিত্যিকেরা কিছুটা হলেও নির্লিপ্ততা দেখিয়েছেন। তবে মানুষের কবি, মাটির কবি রবীন্দ্রনাথের গল্প লেখার পড়ন্তবেলায় বেশ কয়েকটি গল্পে এই পেষার মানুষের অস্তিত্ব মেলে। ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পের 'রবিবার', 'শেষ কথা', 'ল্যাবরেটরি'-তে যন্ত্রবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, কারিগরীবিদ্যা প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। 'গল্পগুচ্ছ'-এর 'বলাই' গল্পেও এই পেশার মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। তবে 'তিনসঙ্গী'র বহুপূর্বে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত 'চোখের বালি' উপন্যাসে এই পেশার ইঙ্গিত রয়েছে। ১৯৩৩ সালের রচিত 'দুইবোন' উপন্যাসে থেকেই এই পেশার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আরও গভীর ভাবে প্রকাশ পায়।

3. MATERIALS:

বর্তমান গবেষণাপত্রে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার মানুষদের জীবন-জীবিকার স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। এই পেশার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টির উপর বিশেষ আলোকপাতের জন্য অন্যান্য সমালোচকের মন্তব্য ও মূলপাঠ্যগ্রন্থের উদ্‌ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

4. FINDINGS:

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা কেন্দ্রিক যে সমস্ত চরিত্রগুলি রয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হল—

ক্রমিক নং.	গল্পের নাম	চরিত্রের নাম
১.	বলাই	বলাই-এর বাবা
২.	রবিবার	অভীক
৩.	শেষ কথা	নবীনমাধব
৪.	ল্যাবরেটরি	নন্দকিশোর
৫.	'সে' গ্রন্থের '১৪' অধ্যায়	সুকুমার

তালিকা – ক

আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই পেশা কেন্দ্রিক যে চরিত্রগুলিকে পাওয়া যায় তার একটি তালিকা দেওয়া হল—

ক্রমিক নং.	উপন্যাসের নাম	চরিত্রের নাম
১.	চোখের বালি	বিহারী
২.	দুইবোন	শশাঙ্কমৌলি

তালিকা – খ

যন্ত্রবিদ্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ কত গভীর তার-ই প্রতিফল এই গল্প-উপন্যাসগুলি। তবে 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলিতে অভিনবত্ব আর বুদ্ধি দীপ্তিতে অতি আধুনিক জীবন পরিস্থিতি ও সমাজ নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্বের প্রতি ঘনীভূত আকর্ষণের পরিচয় বহন করে।[৫] যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। চলাই যেমন জীবনের ধর্ম, তেমনই সেই জীবনকে টিকিয়ে রাখতে মানুষকে কোন না কোন পেশাতে নিযুক্ত হতেই হয়। যে পেশাতে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সেই পেশাতেই মানুষের ঝোঁক বেশি। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে না চললে মানুষকে পিছিয়ে পড়তে হবে রবীন্দ্রনাথ এটা ভালোভাবেই জানতেন। আমরা সবাই তারা কবিসত্ত্বা নিয়েই বেশি আলোচনা করে থাকি। তিনি যে প্রকৃত অর্থে একজন সমাজতাত্ত্বিক, নৃ-তাত্ত্বিক। তিনি তাঁর সাহিত্যে নৃবিজ্ঞানীর ন্যায় ভারতের জাতি-বর্ণ-পেশার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় সেই পেশার গুরুত্ব কি হতে পারে তিনি তারও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা।

সমাজকল্যাণে যন্ত্রবিদ্যার গুরুত্বকে তিনি কখনও অস্বীকার করেননি। তবে যন্ত্রের ভয়াবহ রূপও তিনি তুলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে তো এবিষয়ে বহু প্রমাণ রয়েছে। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে যন্ত্রবিদ্যার প্রয়োগ, প্রযুক্তিবিদ্যার সফলতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। দেখা যায় এই সমস্ত গল্প-উপন্যাসে চরিত্রেরা যন্ত্রবিদ্যাকে আয়ত্ত করতে চেয়েছে ঠিকই কিন্তু সফল হওয়ার পথে যে বিস্তর বাধা রয়েছে তাও তারা অনুভব করেছে। 'ল্যাবরেটরি' নন্দকিশোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাকে আয়ত্ত করে সফল ইন্ড্রাস্টিয়ালিস্ট হয়ে উঠেন। 'দুইবোন' উপন্যাসে দেখা যায় শশাঙ্ক ইংরেজ অবমাননায় সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন জীবিকাকে বেছে নিয়েছে।

উল্লেখিত তালিকা 'ক' ও তালিকা 'খ' চরিত্রেরা এই পেশাতে কি কারণে প্রবেশ করেছে তার একটা Motive তুলে ধরার হল—

- 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিহারী শখের বশবর্তী হয়ে এই বিদ্যাশিক্ষা আয়ত্ত করেছিল। তার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চবিত্ত মানুষের Motive কাজ করেছিল।
- 'দুইবোন' উপন্যাসের শশাঙ্কমৌলি জীবিকা হিসেবেই এই পেশাকে ধরে ছিলেন।
- 'বলাই' গল্পে বলাই-এর বাবা স্ত্রীবিয়োগের একাকীত্ব থেকে এই পেশা শিক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন।
- 'রবিবার' গল্পে অভীকের এই বিদ্যার প্রতি আগের থেকেই একটা শখ ছিল। কিন্তু সে ছিল আর্টিস্ট মানুষ। তাই এই পেশাকে সেও বিহারীর মত শখ হিসেবেই দেখত।
- 'শেষকথা' গল্পে "আমেরিকায় যাওয়ার পর বিপ্লবী নবীনমাধবের গোত্রান্তর হয়েছে। 'ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা' করাই হয়েছে তার ব্রত। এই ব্রতসাধনে সে প্রথমে দীক্ষা নিয়েছে যন্ত্রবিদ্যার; তারপরে খনিবিদ্যা, খনিজবিদ্যা।"[৭] পরে ভূতাত্ত্বিকের জীবিকাতে প্রবেশ করেছেন।
- 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নন্দকিশোর প্রকৃত অর্থে বৈজ্ঞানিক, তবে তিনি প্রথম জীবনে ইঞ্জিনিয়ারিং বৃত্তিকেই জীবিকার মাধ্যম করেছিলেন। এই জীবিকা থেকেই পরবর্তীতে তিনি একজন সফল ইন্ড্রাস্টিয়ালিস্ট হন।
- সুকুমারও অভীকের মত আর্টিস্ট হতে চেয়েছিল কিন্তু তার বাবার জেদের কাছে যখন তার স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়, তখন সে বাধ্য হয়ে বিলেতে যায় পাইলট হওয়ার জন্য।

5. ANALYSIS:

'গল্পগুচ্ছ'-এর একমাত্র 'বলাই' গল্পে প্রথম এই পেশার ইঙ্গিত রয়েছে। বলাই-এর বাবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিলেতে যাত্রা করেছে এই পেশার শিক্ষা গ্রহণের জন্য। গল্পে এর বেশি আর কোন বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় না। তখন বিলেত-ই ছিল এই বিদ্যা শিক্ষার উত্তম ক্ষেত্র। দেশের পরিস্থিতি এ বিষয়ে বিশেষ অনুকূল ছিল না।

'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পতেই এই পেশার মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। 'তিনসঙ্গী' প্রথম গল্প 'রবিবার' ১৩৪৬ সালের ২৫ আশ্বিন শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। এই গল্পের নায়ক অভীক আর্টিস্ট মানুষ। তাকে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রকর' গল্পের চুনিলালের পরিণত রূপও বলা চলে।[৮] তার জীবনে দুটো উলটো জাতের শখ ছিল—

> "এক কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনখানি মোটরগাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্ত্রবিদ্যায় ওর হাতে-খড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েন্টের ছিল মোটরের কারখানা, সেইখানে ও শখ ক'রে বেকার খেটেছে অনেকদিন।"[৯]

এই শখের বশে সে যন্ত্রবিদ্যাকে আয়ত্ত করেছিল। পেশার তাগিদে নয়। তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য আর্টিস্ট হওয়া। তবে এই বিদ্যার জোরে ত্যাজ্যপুত্র হওয়ার পর অভাবের দিনে অভীকের রুজির সংস্থান জুটেছে। কবির ভাষায়—

> "অভীকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। ময়লা টুপি আর তেলকালিমাখা নীলরঙের জামা-ইজের প'রে বার্ন কোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেডমিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে।"[১০]

এই কোম্পানিতে কাজ করে হাতে কিছু টাকা জমলে অভীক অজ্ঞাতবাস থেকে এসেছে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্ট রূপে। শেষপর্যন্ত সে তার আর্টিস্ট সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখতে জাহাজের স্টোকার হয়ে রওনা দেয় বিলেতে।

অন্যদিকে আলোচ্য পেশায় বিবিধ স্তরের ইঙ্গিতও গল্পকার দিয়ে রাখলেন। এক অংশের বাঙালি এই পেশায় অস্পষ্ট, ময়লা ও তেলকালিমাখা শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছিল।

'তিনসঙ্গী' দ্বিতীয় গল্প 'শেষকথা' গল্পের নায়ক নবীনমাধব বাংলাদেশের স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবীদলের একজন। সেও কিন্তু জীবিকার জন্য এই পেশাতে আসেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি তাকে একসময় আন্দামানে নিয়ে যায়। নানা বাঁকা পথে সি.আই.ডি.-র ফাঁস এড়িয়ে আফগানিস্তান পর্যন্ত সে পৌঁছে যায়। অবশেষে খালাসির কাজ নিয়ে সে পৌঁছে যায় আমেরিকায়। সে এ সময়কার য়ুরোপীয় মহাসমরের ভীষণ প্রলয় রূপ দেখেছে। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে যুগান্তসাধিনী সর্বনাশকে ঠেকাতে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা। ফলে সে দীক্ষা নিয়েছে যন্ত্রবিদ্যার।

> "ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর-কারখানায় কোনোমতে ঢুকে পড়লুম। হাত পকাচ্ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছিল না খুব বেশি দূর এগোচ্ছি।"[১১]

দেশের উন্নতি করা-ই তার ব্রত। দেশের উন্নতির জন্য সে বেছে নিয়েছে যন্ত্রবিদ্যাকে। তার সামনে উপস্থিত বর্তমান ও অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে বুঝেছে দেশ বা দশের উন্নতির জন্য যন্ত্রবিদ্যা অপরিহার্য। যন্ত্রকে মন্ত্রশক্তিতে বশ না করতে পারলে দেশের রথচক্র সচল হবে না। কিন্তু ইংরেজ ফোর্ডের সংকল্প স্বজনপোষণ। তিতিরিক্ত হয়ে সে এই বৃত্তি ছেড়ে দেশের ভূগর্ভের খনিজ উপাদানের তল্লাসের জন্যে 'খনিজ বিদ্যা' শিখতে শুরু করে।

'তিনসঙ্গী' গ্রন্থের 'ল্যাবরেটরি'র নন্দকিশোর 'লন্ডন-য়ুনির্ভাসিটি' থেকে পাশ করা 'এঞ্জিনিয়ার'। বাঙালি বলেই উপযুক্ত পারিশ্রমিক জোটেনি। নিজস্ব বুদ্ধির জোরেই তিনি টাকা কামিয়েছিলেন বিস্তার—

> "রেলওয়ে কোম্পানির দুটো বড় ব্রিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও-কাজের আয়ব্যায়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টান্তটা সাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডানহাত বাঁহাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করে নি।"১২

যন্ত্রবিদ্যা ছিল তার রক্ত মজ্জায় মজ্জায়। এই জীবিকাতে প্রবেশ করে নন্দকিশোরের মধ্যে থাকা সুপ্ত বৈজ্ঞানিক সত্ত্বা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। যে বাঁকাপথে সে উপার্জন বৃদ্ধি করেছিল সেই উপার্জনের অর্থে একসময় সাহেবের আনুকূল্যে রেল-কোম্পানির পুরনো লোহালক্কড় সস্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফেঁদে বসেন। শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠেন

একজন সফল ইন্ড্রাস্টিয়ালিস্ট। প্রকৌশল বিদ্যায় নিপুণ, লোভনীয় পদমর্যাদায় ফুলে ফেঁপে ওঠা শ্বেতশুভ্র যুবকের ছবি ফুটে ছবি গল্পকার তুলে ধরেছেন।

'সে' গ্রন্থের '১৪' অধ্যায়ে সুকুমার নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে শেষপর্যন্ত য়ুরোপে যাত্রা করেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরির প্রশিক্ষণে। তার ইচ্ছে ছিল নন্দলালাবুর কাছে ছবি আঁকার প্রশিক্ষণ নেওয়া। আর পিতা চেয়েছিল আইনি বিদ্যা পড়িয়ে তাকে নিজের পায়ে দাড় করাতে। কারণ সে জানে ছবি একে জীবিকার্জন করা সম্ভব নয়, তাতে কেবল—"আঙুল চলে, পেট চলে না।" শুধু তাই নয়, তার রূঢ় বাক্যকে সুকুমার সহজেই মেনে নিতে পারেনি। তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য সুকুমার বরিশালের মাতামহের সাথে পরামর্শ করে কিছু টাকা নিয়ে বিলেতে যাত্রা করেছে অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে—

> "সুকুমার বালটির মধ্যে তিন সঙ্গী গ্রন্থের অভিককুমারের পূর্বগামিনী ছায়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে হয়। দু'জনেই ছিল চিত্রকর, আর অবশেষে এঞ্জিনীয়ার হইবার উদ্দেশ্যে দু'জনেই বিলাত রওনা হইয়া গিয়াছে। অভীককুমার বাল্যকালে হয়তো বা সুকুমারের মতোই ছিল।"[১৩]

রবীন্দ্র-ছোটগল্পে যেমন স্বল্প পরিসরে ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতি রয়েছে, তেমনি তাঁর উপন্যাসেও দু-একজন ইঞ্জিনিয়ারকে পাওয়া যায়। যে কজন ইঞ্জিনিয়ারকে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে বিহারীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষার পেছনে জীবিকার তাগিদ ছিল না। কবির ভাষায়—

> "বিহারীর উদ্যম অশেষ; একটা-কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার জো নাই, অথচ যশের তৃষ্ণা, টাকর লোভ এবং জীবিকার জন্য উপার্জনের প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ছিল না।"[১৪]

বিহারীর অনুসন্ধিৎসু প্রবণতাই তাকে যন্ত্রবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। একারণেই সে কলেজের ডিগ্রী শেষ করে প্রথমে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে যায়। তবে—

> "যতটুকু জানিতে তাহার কৌতূহল ছিল, এবং হাতের কাজে যতটুকু দক্ষতালাভ সে আবশ্যক বোধ করিত সেইটুকু সমাধা করিয়াই সে মেডিকাল কালেজে প্রবেশ করে।"[১৫]

আসলে 'চোখের বালি' উপন্যাসের যে সমস্ত চরিত্রগুলি রয়েছে তার অধিকাংশই তৎকালীন কলকাতা শহরের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বিশেষ। তাদের মধ্যে একটা উচ্চবিত্ত ভাবধার কাজ করেছে। বিহারীও সেই দলভুক্ত একজন। 'সব শেখা চাই' এই মানসিকতার ফলই তার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ।

'দুই বোন' উপন্যাসে প্রধান চরিত্র শশাঙ্ক সরকারী ইঞ্জিনিয়ার। যে বছর সে এম.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করে সেই বছর তার বিবাহ হয়। শ্বশুরের অর্থে সে শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। হয়ে ওঠে ডিস্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের পদে অ্যাকটিনী। ঘরে সে যতই ঢিলেমি করুক না কেন চাকরির কাজে সে অত্যন্ত পাকা। তবে আসন্ন উন্নতির সময় মোড় উল্টো দিকে ঘুরে যায়। কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্তার সুপারিশে কাঁচা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইংরেজ যুবক তার আসন দখল করে বসে। ইংরেজের বাঙালির প্রতি এই অবমাননা শশাঙ্ক সহজে হজম করে নিতে পারেনি।

এই পরিণতি কেবল শশাঙ্ক নয় তা যেন 'শেষকথা'-র নবীনমাধবের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি বাস্তবের বাঙালি তথা ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও নির্মম সত্য। পরাধীন জাতির প্রতিনিধি হিসেবে, সভ্যতার গর্বে গর্বিত ইংরেজদের কাছে বারবার অন্যায়ের শিকার হতে হয়েছে। যোগ্যতার মূল্যায়নে দুর্নীতি তখন মজ্জাগ্রস্ত, পরাধীন ভারতবর্ষে কর্মক্ষেত্রে বাঙালি তথা ভারতীয়দের বঞ্চনা ঔপন্যাসিকের কলমের সূক্ষ্ম খোঁচায় ফুটে ওঠে। শশাঙ্ক স্বাধীনচেতা যুবক। তাই এই অবমাননাকর পরিবেশে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশেষে স্ত্রী শর্মিলার চাপে শশাঙ্ক চাকুরি থেকে ইস্তফা দেয়। মধ্যবিত্ত জীবনে আভিজাত্যর স্বাদ এনে দেওয়া ঐ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া সাহসী সিদ্ধান্ত সন্দেহ নেই। স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিত জীবন, শ্রেণি বদলের হাতছানি উপেক্ষা করে শশাঙ্ক এখানে আত্মমর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তবে

যে কোনো মূল্যে ভবিষ্যৎ গড়ার শিক্ষিত বাঙালি তখনও তৈরি হয়নি। শশাঙ্কের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়েছে কেবলমাত্র সহধর্মিণী শর্মিলার জন্যই।

6. CONCLUSION:

প্রকৌশলী বিদ্যা উদ্‌ভূত দানবীয় লোভ সম্পর্কেও সচেতন করেছেন গল্পকার। তাঁর চোখে ধরা পড়েছে 'গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুঠির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে'—আসছে ঐ রাক্ষসের মায়ামৃগের টানে। প্রযুক্তিবিদ্যা প্রকৌশলবিদ্যার হাত হাত ধরে ধনতন্ত্র তার বিরাট শূন্যতার দিক আকর্ষণ করছে। ধনের কদর্যতার চেহারা দেখে শিহরিত হচ্ছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। লেখক এ বিষয়েও সচেতন যে—"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।" তখন মানুষ আংশিকতার আবরণে ঢাকা পড়ে। পূর্ণ চৈতন্যের দ্বার তার কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়। আর তখনই কবি আহ্বান করেন নারীকে, নন্দিনীকে। প্রাণের বেগ যন্ত্রকে আঘাত করতে থাকে। ছিন্ন করে লুব্ধ প্রচেষ্টার বন্ধনজাল।

এই অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বসে প্রকৌশল বিদ্যা রবীন্দ্র সমকালে কেমন ছিল তার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা হল। তবে এটাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না যে অন্যান্য পেশার মত এই পেশাতেও নারীদের উপস্থিতি শূন্যই ছিল। যদিও স্বাধীনতার কিছু পূর্বে সেই ধারাতে বিরাম পড়তে দেখি। এ. ললিতা, ইলা মজুমদার, পিকে থ্রেসিয়া, শকুন্তলা ভগৎ, রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী রেড্ডি, নীলাম্বর কোশি প্রমুখ বিদুষী নারী ভারতবর্ষ তথা বাংলার প্রথম দিকের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছেন।

REFERENCES:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'নানাবিদ্যার আয়োজন', 'জীবনস্মৃতি'; রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড (১৪২২), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা-১৭, পৃ. ৪২৪।
২. ভট্টাচার্য ডক্টর বুদ্ধদেব, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান (১৯৬০), বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা-০৯, পৃ. ৩৮৭।
৩. তদেব, পৃ. ৩৮৮।
৪. তদেব।
৫. তদেব।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (২০১৬-২০১৭), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১১৫।
৭. তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ (২০১৮), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা–৭৩, পৃ. ৩৭২।
৮. তদেব, পৃ. ৩৬৯।
৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রবিবার', তিনসঙ্গী; রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড(১৪২২), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৃ. ২৪২।
১০. তদেব।
১১. 'শেষকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।
১২. 'ল্যাবরেটরি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।
১৩. বিশী প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (১৪২৪), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা-৭৩, পৃ. ৭৩।
১৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'চোখের বালি'–৩৫, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ১৪২২, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৃ. ৪৬০।
১৫. তদেব।